بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২১ জানুয়ারি, ২০২২ মোতাবেক ২১ সুলাহ্, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেনঃ

বর্তমানে হযরত আবু বকর (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছে। মদীনায় পৌছার পর মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এ সম্পর্কে সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন যে.

মদীনা জীবনের সর্বপ্রথম কাজ ছিল মসজিদে নববীর নির্মাণ। যে জায়গায় তাঁর (সা.) উটনী গিয়ে বসে পড়েছিল সেই জায়গাটি মদীনার দুই মুসলমান বালক, সাহল ও সোহেলের মালিকানাধীন ছিল। এরা দু'জন হযরত আসাদ বিন যুরারার তত্ত্বাবধানে ছিল। এটি একটি পরিত্যক্ত জমি ছিল যার একাংশে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন খেজুর গাছ ছিল এবং অপরাংশে কিছু ধ্বংসাবশেষ ছিল। মহানবী (সা.) এ জায়গাটিকে মসজিদ এবং তাঁর বিভিন্ন কক্ষ নির্মাণের জন্য পছন্দ করেন। তিনি উক্ত জমির মূল্য দশ দিনার নির্ধারণ করেন। সে যুগে তিনি (সা.) ও অন্যরা জমির এ মূল্যই নির্ধারণ করেন। যাহোক, দশ দিনারের বিনিময়ে উক্ত জমি ক্রয় করা হয় এবং জমি সমান করে, গাছপালা কেটে মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। মহানবী (সা.) নিজে দোয়া করে এর ভিত্তি প্রস্তর রাখেন এবং মসজিদে কুবার ন্যায় এখানেও সাহাবীরা মিস্ত্রি ও শ্রমিকের কাজ করেন আর এ কাজে কখনও কখনও মহানবী (সা.) নিজেও অংশগ্রহণ করতেন।

যেমনটি বলা হয়েছে, এই মসজিদ ও বাড়ির জন্য এই জায়গাটুকু মহানবী (সা.) দশ দিনারে ক্রয় করেছিলেন এবং বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.)'র সম্পদ থেকে এই মূল্য পরিশোধ করা হয়েছিল। মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে আরো বিস্তারিত বিবরণ হল, নির্মাণ কাজ আরম্ভ হওয়ার সময় মহানবী (সা.) তাঁর পবিত্র হাতে একটি ইট স্থাপন করেন। এরপর তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে ডাকেন। তিনি (রা.) এসে মহানবী (সা.)-এর ইটের পাশে একটি ইট স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে ডাকেন। তিনি (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র স্থাপিত ইটের পাশে একটি ইট স্থাপন করেন এরপর হযরত উসমান (রা.) আসেন এবং তিনি হযরত উমর (রা.)'র ইটের পাশে একটি ইট স্থাপন করেন।

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন মসজিদ নির্মাণ করেন তখন তিনি (সা.) উক্ত মসজিদের ভিত্তি-মূলে একটি পাথর স্থাপন করেন আর হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, তোমার পাথর আমার পাথর ঘেঁষে স্থাপন কর এরপর তিনি হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, তুমি তোমার পাথর আবু বকরের পাথরের সাথে রাখ, এরপর হযরত উসমান (রা.)-কে বলেন, তুমি তোমার পাথর উমরের পাথর-সন্নিবেশিত করে রাখ। ৭ম হিজরীর মহররম মাসে

মহানবী (সা.) যখন খয়বরের যুদ্ধ থেকে সফল ও বিজয়ীর বেশে ফিরে আসেন তখন তিনি মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ এবং নুতনভাবে নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। এবারও তিনি (সা.) সাহাবী (রা.)-দের সাথে মিলেমিশে মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেন। উবায়দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন বাড়িঘরের জন্য জমি বরাদ্দ দেন তখন হযরত আবু বকর (রা.)'র জন্য তাঁর ঘরের জায়গা মসজিদ সংলগ্ন নির্ধারণ করেন।

হযরত আবু বকর (রা.)'র ভ্রাতৃত্ব স্থাপন সম্পর্কিত বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর এবং হযরত খারেজা বিন যায়েদ (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছেন। হযরত উমর (রা.)'র সাথে {হযরত আবু বকর (রা.)'র} ভ্রাতৃত্ব বন্ধন মক্কায় স্থাপিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.)'র সাথে {হযরত আবু বকর (রা.)'র} ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের যে রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, তা মূলত মক্কার ঘটনা ছিল। যেমন আল্লামা ইবনে আসাকির লিখেছেন, মহানবী (সা.) মক্কায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ও উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। অতঃপর মহানবী (সা.) মদীনায় এসে দু'টি ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ব্যতীত সকল ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রহিত করে দেন। সেই দু'টি ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অটুট থাকে। এর একটি ছিল মহানবী (সা.) ও হযরত আলী (রা.)'র মাঝে এবং অপরটি হযরত হামযা (রা.) ও হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)'র মাঝে ছিল। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন কখন স্থাপিত হয়েছিল, এ সম্পর্কে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দু'বার স্থাপিত হয়েছিল। সহীহ্ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা কাস্তালানী বলেন, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দু'বার স্থাপিত হয়েছিল। প্রথমবার হিজরতের পূর্বে মক্কায় মুসলমানদের মাঝে (ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপিত) হয়। এতে মহানবী (সা.), হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)'র মাঝে, হযরত হামযা (রা.) ও হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)'র মাঝে, হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)'র মাঝে, হযরত যুবায়ের ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)'র সাথে এবং হযরত আলী (রা.) ও নিজের সাথে মহানবী (সা.) ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি (সা.) যখন মদীনায় আসেন তখন হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)'র গৃহে মুহাজির ও আনসারদের মাঝে নতুনভাবে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। ইবনে সাদ (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) একশ' জন সাহাবীর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন, অর্থাৎ, পঞ্চাশ জন মুহাজির ও পঞ্চাশ জন আনসারের মাঝে।

বদরের যুদ্ধ ও হযরত আবু বকর (রা.): এ সম্পর্কে উল্লিখিত রয়েছে, দ্বিতীয় হিজরী সনের রমযান মাস মোতাবেক ৬২৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বদরের যুদ্ধে যাত্রার প্রাক্কালে সাহাবীদের কাছে কেবল সত্তরটি উট ছিল, তাই এক একটি উট তিনজনের জন্য নির্ধারিত ছিল এবং প্রত্যেকে পালাক্রমে (উটে) আরোহণ করতেন। হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) একটি উটে পালাক্রমে আরোহণ করেন। যখন

তিনি (সা.) বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন সে সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলাকে প্রতিহত করার জন্য মদীনা থেকে বের হন– যে সিরিয়া থেকে ফিরে আসছিল। মুসলমানদের কাফেলা যখন মদীনার নিকটস্থ সাফরা উপত্যকার পার্শ্ববর্তী জাফরাণ উপত্যকায় পৌঁছে, তখন তিনি (সা.) কুরাইশদের সম্পর্কে জানতে পারেন যে, কুরাইশরা তাদের বাণিজ্য কাফেলার সুরক্ষার জন্য বেরিয়ে পড়েছে। মহানবী (সা.) সাহাবায়ে কেরামের (রা.) কাছে পরামর্শ চান এবং তাদেরকে অবগত করেন যে, মক্কা থেকে একটি সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে; এমতাবস্থায় তোমাদের মতামত কী? সৈন্যদলের বিপরীতে তোমাদের কাছে কি বাণিজ্য কাফেলার (মোকাবিলার করা) অধিক পছন্দনীয়? তারা বলেন, কেন নয়? একটি দল বলে, আমরা শত্রুর (সৈন্যদলের) মোকাবিলায় বাণিজ্য কাফেলাকে বেশি পছন্দ করছি। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, একটি দল বলে, আপনি আমাদেরকে যুদ্ধের কথা কেন বলেন নি? তাহলে আমরা এর প্রস্তুতি নিয়ে আসতাম। আমরা তো বাণিজ্য কাফেলার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার বাণিজ্য কাফেলার দিকেই যাওয়া উচিত আর আপনি শত্রুর সেনাদলকে উপেক্ষা করুন। এর ফলে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারার রং বদলে হয়ে যায়। হযরত আবু আইয়্যুব (রা.) বর্ণনা করেন,

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (সূরা আল্ আনফাল: ৬)

আয়াত উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত আয়াতের অর্থ হল, **তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমাকে সংগত উদ্দেশ্যেই তোমার বাড়ি থেকে বের করে এনেছিলেন, যদিও মু'মিনদের এক দল তা অবশ্যই অপছন্দ করতো।** তখন হযরত আবু বকর (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং অনেক চমৎকার বক্তব্য রাখেন। এরপর হযরত উমর (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং অতি উত্তম বক্তব্য রাখেন। পুনরায় হযরত মিকদাদ (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্ আপনাকে যে কাজের আদেশ দিয়েছেন সেদিকেই অগ্রসর হোন। আমরা আপনার সাথে আছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা আপনাকে সেকথা বলব না যা বনী ইসরাঈল মূসা (আ.)-কে বলেছিল, **فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ** অর্থাৎ, যাও, তুমি আর তোমার প্রভু দু'জন মিলে যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকব। (সূরা আল্ মায়েদা: ২৫)

তিনি (রা.) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেহে প্রাণ আছে, আমরা আপনার সাথে মিলে যুদ্ধ করব। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহকারে নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন। আপনি যদি আমাদেরকে **'বারকুল গিমাদ'** পর্যন্তও নিয়ে যান তাহলে আমরাও আপনার সাথে যুদ্ধ করতে করতে প্রসন্ন চিত্তে সেখানে চলে যাব। **বারকুল গিমাদ মক্কা থেকে পাঁচ রাত দূরত্বের একটি উপকূলীয় শহর।**

যাহোক, হযরত আবদল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল দেখেছি, একথা শুনে তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তিনি এই কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হন।

এরপর মহানবী (সা.) জাফরান থেকে যাত্রা করে বদরের নিকটবর্তী স্থানে যাত্রা বিরতি করেন বা শিবির স্থাপন করেন। এরপর তিনি (সা.) এবং তাঁর সফরসঙ্গীদের একজন বাহনে আরোহণ করেন। সীরাত ইবনে হিশাম অনুযায়ী সেই ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। অন্য বর্ণনানুযায়ী হযরত আবু বকর (রা.)'র পরিবর্তে হযরত কাতাদা বিন নো'মান (রা.) অথবা হযরত মু'য়ায বিন জাবাল (রা.)'র উল্লেখ রয়েছে। এক পর্যায়ে তিনি (সা.) আরবের এক বৃদ্ধ ব্যক্তির কাছে গিয়ে থামেন এবং তাকে কুরাইশ এবং মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সফরসঙ্গীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে, এদের সম্পর্কে তার কাছে কী তথ্য আছে? সবাই যখন বদরের প্রান্তরে একত্রিত হন তখন মহানবী (সা.) এর জন্য একটি তাঁবু খাটানো হয়েছিল। এটি তৈরি করা সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে,

অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মু'য়াযের প্রস্তাবে সাহাবীরা বদর প্রান্তরের একটি অংশে মহানবী (সা.)-এর জন্য একটি তাঁবু খাটিয়ে দেন এবং সা'দ (রা.) মহানবী (সা.)-এর বাহন তাঁবুর এক পার্শ্বে বেঁধে রেখে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি এই তাঁবুতে বসুন আর আমরা আল্লাহ্র নাম নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করছি এবং হযরত সা'দ (রা.) সহ অন্যান্য কতিপয় আনসার সাহাবী পাহারা দেয়ার জন্য দণ্ডায়মান হন। মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) এই তাঁবুতেই রাত্রি যাপন করেন। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) তাঁবুতে নগ্ন তরবারি হাতে নিয়ে তাঁর নিরাপত্তার জন্য তাঁর (সা.) কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন। আর মহানবী (সা.) সারারাত আল্লাহ্র দরবারে বিগলিতচিত্তে দোয়া করেন। উল্লেখ আছে যে, পুরো সৈন্যবাহীনির মাঝে একমাত্র তিনিই রাতভর জাগ্রত ছিলেন বাকী সবাই পালা করে ঘুমিয়ে নিয়েছেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র সাহসিকতা ও বীরত্ব সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)'র একটি প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত রয়েছে বা তিনি (রা.) বর্ণনা করেন যে, তিনি সাহাবীদের একটি দলকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমাকে মানুষের মাঝে সব থেকে বেশি সাহসী ব্যক্তি সম্পর্কে বলো। এর উত্তরে লোকেরা বলে, আপনি অর্থাৎ হযরত আলী। হযরত আলী (রা.) বলেন, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহসী ব্যক্তি হলেন, হযরত আবু বকর (রা.)। বদরের যুদ্ধের সময় যখন আমরা মহানবী (সা.)-এর জন্য ছাউনি তৈরি করেছিলাম। তখন আমরা বললাম, কে আছে যে মহানবী (সা.)-এর সাথে থাকবে যাতে তাঁর (সা.) ধারে-কাছে কোন মুশরিক পৌঁছতে না পারে। আল্লাহ্র কসম! তখন আমাদের মধ্যে থেকে হযরত আবু বকর (রা.) ছাড়া আর কেউ মহানবী (সা.)-এর নিকটে যায়নি। তিনি তরবারি বের করে মহানবী (সা.) মাথার কাছে দণ্ডায়মান হন এবং বলেন,

মহানবী (সা.)-এর ধারে-কাছে কোন মুশরিকের পৌঁছাতে হলে প্রথমে আবু বকরের সাথে লড়াই করতে হবে।

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত আলী (রা.) একদা বলেন, সাহাবীদের মাঝে সবচেয়ে বেশি সাহসী ও নির্ভীক ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। এরপর তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধে যখন মহানবী (সা.)-এর জন্য একটি উঁচু যায়গা নির্ধারণ করা হয় তখন এই প্রশ্ন জাগে যে, আজ মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তার দায়িত্ব কার ওপর অর্পণ করা হবে। এতে হযরত আবু বকর (রা.) তৎক্ষণাৎ নগ্ন তরবারি নিয়ে দণ্ডায়মান হন আর তিনি সেই চরম বিপদের সময় পরম বীরত্বের সাথে তাঁর (সা.) নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন একটি বড় তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি (সা.) বলেন, **اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ. اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ** অর্থাৎ, '**হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমাকে তোমারই প্রতিশ্রুতি ও তোমারই অঙ্গীকারের দোহাই দিচ্ছি। হে আমার প্রভু! যদি তুমিই মুসলমানদের ধ্বংস চাও তাহলে আজকের পর তোমার ইবাদতকারী কেউ (অবশিষ্ট) থাকবে না।**' তখনই হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর হাত ধরে ফেলেন আর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এবার থামুন। আপনি আপনার প্রভুর কাছে দোয়াতে অনেক বেশি আকুতি-মিনতি করেছেন। তখন তিনি বর্ম পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। তিনি (সা.) তাঁবু হতে বের হন আর এই (আয়াত) পাঠ করছিলেন যে, **سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ** অর্থাৎ, অচিরেই তাদের সবাই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। আর এটিই সেই ক্ষণ যা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল আর এই মুহূর্ত অত্যন্ত কঠোর এবং অত্যন্ত বিস্বাদ। **(সূরা আল্ কামার: ৪৬-৪৭)**

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) মুশরিকদের দেখেন, যাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার আর তাঁর সাহাবীদের সংখ্যা ছিল ৩১৯ জন। আল্লাহ্‌র নবী (সা.) ক্বিবলামুখী হয়ে নিজের উভয় হাত তুলেন এবং নিজ প্রভুকে উচ্চস্বরে ডাকতে থাকেন যে, **اللهمَّ أَنْجِزْ لِي ما وعدتَنِي، اللهم آتِ ما وعدتَنِي، اللهمَّ إِنْ تَهْلِكْ هذه العِصابةُ من أهل الإسلام لا تُعْبَدْ في الأرض»** অর্থাৎ, '**হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছ তা পূর্ণ কর। হে আমার আল্লাহ্! আমাকে তুমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাকে দান কর। হে আমার আল্লাহ্! তুমি যদি মুসলমানদের এই দলটিকে ধ্বংস করে দাও তাহলে পৃথিবীর বুকে তোমার ইবাদত করা হবে না।**' হাত তুলে ক্বিবলামুখী হয়ে (এভাবে) তিনি (সা.) অনবরত নিজ প্রভুকে উচ্চস্বরে ডাকতে থাকেন আর একপর্যায়ে তাঁর চাদর তাঁর কাঁধ থেকে পড়ে যায়। তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর কাছে আসেন আর তাঁর চাদর তাঁর কাঁধে তুলে দেন। অতঃপর তিনি (রা.) পিছন দিক থেকে মহানবী (সা.)-কে জড়িয়ে ধরেন এবং নিবেদন

করেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! নিজ প্রভুর সন্নিধানে আপনার কাকুতি-মিনতিপূর্ণ দোয়া আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনি আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার অবশ্যই পূর্ণ করবেন। তখন আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ অর্থাৎ, **স্মরণ কর যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ফরিয়াদ করছিলে, তিনি তোমাদের ফরিয়াদ গ্রহণ করেছেন এই প্রতিশ্রুতির সাথে যে, আমি অবশ্যই এক হাজার সারিবদ্ধ ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে তোমাদের সাহায্য করব।** (সূরা আল্ আনফাল : ১০) অতএব, আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশ্‌তাদের মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বদরের যুদ্ধের ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে এর বিশদ বিবরণ এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মহানবী (সা.) সাহাবীদের সম্বোধন করে এ-ও বলেন যে, কাফিরদের সৈন্যদলে এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা স্বেচ্ছায় এই যুদ্ধে আসেনি, বরং কুরাইশ নেতাদের চাপে পড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে; মন থেকে তারা আমাদের বিরোধী নয়। তেমনিভাবে এমন কিছু লোকও এই সৈন্যদলে রয়েছে, যারা মক্কায় আমাদের বিপদের দিনে আমাদের সাথে ভদ্রোচিত ব্যবহার করেছিল; এখন আমাদের দায়িত্ব হল, তাদের অনুগ্রহের প্রতিদান দেয়া। তাই যদি এমন কোন ব্যক্তির ওপর কোন মুসলমান প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয় সে যেন তার কোন ক্ষতি না করে। আর তিনি (সা.) বিশেষভাবে প্রথমোক্ত শ্রেণীর মাঝে **আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব** এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মাঝে **আবুল বাখতারী**-র নাম উল্লেখ করেন এবং তাদেরকে হত্যা করতে বারণ করেন। কিন্তু এমন অনিবার্য পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যে, আবুল বাখতারী নিহত হওয়া থেকে বাঁচতে পারেনি, অবশ্য মৃত্যুর পূর্বে সে জানতে পেরেছিল যে, মহানবী (সা.) তাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

সাহাবীদের একথা বলার পর তিনি (সা.) পুনরায় তাঁবুতে গিয়ে দোয়ায় মগ্ন হন। হযরত আবু বকর (রা.)ও তাঁর সাথে ছিলেন, আর তাঁবুর চারপাশে আনসারদের একটি দল সা'দ বিন মু'য়াযের নেতৃত্বে প্রহরায় নিযুক্ত ছিল। স্বল্পক্ষণ পরেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হৈচৈ শোনা যায় এবং জানা যায় যে, কুরাইশ সৈন্যবাহিনী গণহামলা করতে শুরু করে দিয়েছে। তখন মহানবী (সা.) অত্যন্ত ব্যাকুলতার সাথে খোদা তা'লার দরবারে হাত তুলে দোয়া করছিলেন এবং আকুল কণ্ঠে বলছিলেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ

অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্! তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর! হে আমার মালিক, মুসলমানদের এই দলটি যদি আজ এখানে ধ্বংস হয়, তবে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার কেউ থাকবে না। তখন তিনি (সা.) এতটা উৎকণ্ঠিত ছিলেন যে, কখনও তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়ছিলেন, কখনও দণ্ডায়মান অবস্থায় খোদা তা'লাকে ডাকছিলেন, আর তাঁর (সা.) চাদর তাঁর কাঁধ থেকে বারবার পড়ে যাচ্ছিল এবং হযরত আবু বকর (রা.) সেটি তাঁর (সা.) কাঁধে তুলে দিচ্ছিলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, যুদ্ধ করতে করতে আমার মহানবী (সা.)-এর কথা মনে পড়লে আমি দৌড়ে তাঁর

(সা.) তাঁবুর দিকে যেতাম। কিন্তু আমি যতবারই গিয়েছি, তাঁকে (সা.) সিজদায় ক্রন্দনরত দেখতে পেয়েছি। আর আমি তাঁর (সা.) মুখ দিয়ে এই শব্দগুলো উচ্চারিত হতে শুনছিলাম- **'ইয়া হাইয়্যু-ইয়া কাইয়্যুম, ইয়া হাইয়্যু-ইয়া কাইয়্যুম'** অর্থাৎ, হে আমার জীবন্ত খোদা! হে জীবনদাতা প্রভু! হযরত আবু বকর তাঁর (সা.) এই অবস্থা দেখে ব্যাকুল হয়ে যেতেন এবং নিজের অজান্তেই কখনও কখনও বলে উঠতেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত! আপনি বিচলিত হবেন না; আল্লাহ্ অবশ্যই নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। কিন্তু সত্য প্রবাদ, **'হার কে আরেফ- তার আস্ত তারসাঁন-তার'** অর্থাৎ, যে যত বেশি জানে সে ততবেশি ভয়পায়– অনুযায়ী মহানবী (সা.) অনবরত দোয়া ও ক্রন্দনে মগ্ন ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন,

বদরের সময় মহানবী (সা.)-এর যে আচরণ প্রকাশ পেয়েছে, তা-ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট! আর এ থেকে জানা যায় যে, তাঁর (সা.) হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভীতি কত বেশি ছিল! বদরের যুদ্ধের সময়, যখন শত্রুদের মোকাবিলায় তিনি (সা.) নিজের সাহসী ও নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীদের নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, ঐশী সমর্থনের লক্ষণও স্পষ্ট ছিল; কাফিররা তাদের অবস্থান দৃঢ় করার জন্য শক্ত মাটিতে শিবির স্থাপন করেছিল আর মুসলমানদের জন্য বালুময় স্থান ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু খোদা তা'লা বৃষ্টি বর্ষিয়ে কাফিরদের শিবির কর্দমাক্ত করে দেন আর মুসলমানদের অবস্থানস্থল দৃঢ় হয়ে যায়। এমনিভাবে আরও অনেক ঐশী সাহায্য-সমর্থন প্রকাশ পাচ্ছিল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভীতি এতটা প্রবল ছিল যে, সকল প্রতিশ্রুতি ও নিদর্শনাবলী থাকা সত্ত্বেও খোদার অমুখাপেক্ষিতা দৃষ্টে তিনি বিচলিত ছিলেন এবং ব্যাকুল হয়ে খোদার সমীপে দোয়া করেছিলেন যে, মুসলমানদেরকে বিজয় দান কর। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.) গোলাকার তাঁবুতে ছিলেন এবং দোয়া করছিলেন, হে আমার খোদা! আমি তোমাকে তোমার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাচ্ছি এবং সেগুলো পূরণের প্রার্থনা করছি। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি-ই যদি মুসলমানদের ধ্বংস চাও তাহলে আজকের পর তোমার ইবাদত করার আর কেউ থাকবে না। এতে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর (সা.) হাত ধরে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! থামুন, আপনি তো আপনার প্রভুর নিকট দোয়ায় অত্যধিক আকুতিমিনতি করেছেন। তখন মহানবী (সা.) বর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি (সা.) তাঁবু থেকে বের হয়ে এসে বলেন, এখনই এই সৈন্যবাহিনী পরাজিত হবে; আর তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। বরং এটাই তাদের পরিণতির সময় এবং এই সময় তাদের জন্য খুবই কঠিন ও তিক্ত। খোদাভীতির মান কেমন ছিল দেখুন! প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও খোদার অমুখাপেক্ষিতা দৃষ্টিপটে ছিল। কিন্তু বিশ্বাসও এরূপ ছিল যে, হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করতেই তিনি (সা.) উচ্চস্বরে বলেন, আমি ভয় পাই না, বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমি অবগত হয়েছি যে, শত্রুরা পরাজিত হয়ে লাঞ্ছিত হবে এবং কাফির নেতারা এখানেই মরবে; বাস্তবে তা-ই হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

‘পবিত্র কুরআনে বার বার মহানবী (সা.)-কে কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বদরের যুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়, যা ইসলামের প্রথম যুদ্ধ ছিল; তখন মহানবী (সা.) ক্রন্দন ও দোয়া করতে আরম্ভ করেন আর দোয়া করতে করতে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে এই শব্দাবলী নিসৃত হয়, ‘আল্লাহুম্মা ইন্ আহ্লাকতা হাযিহিল ই’সাবাতা ফালান্ তু’বাদ ফিল আরদে আবাদা’ অর্থাৎ হে আমার খোদা! যদি আজ তুমি এই ৩১৩ জনের দলটিকে ধ্বংস করে দাও তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত কেউ তোমার ইবাদত করবে না। হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর মুখ থেকে এই শব্দাবলী নিঃসৃত হচ্ছে শুনে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি কেন এত বিচলিত হচ্ছেন? আল্লাহ্ তা’লা তো আপনাকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমি বিজয় দান করব। তিনি (সা.) বলেন, একথা সত্য; কিন্তু খোদার অমুখাপেক্ষিতা আমার দৃষ্টিপটে রয়েছে। অর্থাৎ, কোন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা আল্লাহ্ তা’লার জন্য বাধ্যতামূলক নয়।’

প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হলে আল্লাহ্র রসূল (সা.) তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসেন এবং লোকজনকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন। লোকেরা তাদের সারিতে আল্লাহ্কে স্মরণ করছিল। মহানবী (সা.) স্বয়ং যুদ্ধ করেন এবং তাঁর পাশাপাশি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)ও যুদ্ধরত ছিলেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.)’র অসাধারণ বীরত্ব সামনে আসে। তিনি (রা.) সকল বিদ্রোহী কাফিরের সাথে যুদ্ধ করার জন্যই প্রস্তুত ছিলেন, যদিওবা (সামনে) তার পুত্রই হোক না কেন। এই যুদ্ধে তাঁর পুত্র আব্দুর রহমান কাফিরদের পক্ষে যুদ্ধ করতে এসেছিল আর তাকে আরবের সবচেয়ে বড় বীরদের একজন মনে করা হতো এবং কুরাইশদের মাঝে তিরন্দাজিতে তিনি সর্বাধিক দক্ষ ছিলেন। ইসলামগ্রহণের পর তিনি তাঁর পিতা হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, বদরের দিন আপনি আমার স্পষ্ট নিশানায় ছিলেন, কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে সরে যাই এবং আপনাকে হত্যা করি নি। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তুমি যদি আমার নিশানায় থাকতে তাহলে আমি তোমা থেকে সরতাম না।

এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

হযরত আবু বকর (রা.) একবার মহানবী (সা.)-এর সাথে খাবারের সময় উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে কথা আরম্ভ হয়। হযরত আব্দুর রহমান, যিনি হযরত আবু বকর (রা.)’র জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন এবং পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিলেন, তিনি বদর বা উহুদের যুদ্ধে কাফিরদের পক্ষ থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। খাবার খাওয়ার সময় কথায় কথায় তিনি বলেন, আব্বাজান! উক্ত যুদ্ধে আপনি ওমুক স্থান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন আর আমি তখন একটি পাথরের পেছনে লুকিয়ে বসে ছিলাম। আমি যদি চাইতাম তাহলে আক্রমন করে আপনাকে হত্যা করতে পারতাম কিন্তু আমি ভাবলাম, নিজের পিতাকে হত্যা করব, তা কীভাবে হয়! হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে বলেন, আল্লাহ্ তোমাকে ঈমানে ধন্য করবেন বলে তুমি রক্ষা পেয়েছ বা তাই তুমি বেঁচে গেছ অন্যথায় আল্লাহ্র শপথ! আমি যদি তোমাকে দেখে ফেলতাম তবে নিশ্চিত হত্যা করতাম।

বদরের যুদ্ধে বন্দীদের বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর পরামর্শ গ্রহণ এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র মতামত কী ছিল আর অন্যদের মতামতের ঊর্ধ্বে হযরত আবু বকর (রা.)'র পরামর্শ অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে, এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন,

মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে মহানবী (সা.) যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে পরামর্শ করেন যে, তাদের বিষয়ে কী করা উচিত? আরবে সাধারণত যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা অথবা স্থায়ীভাবে দাস বানিয়ে রাখার প্রচলন ছিল; কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে মহানবী (সা.)-এর জন্য বিষয়টি ছিল খুবই অসহনীয়। এছাড়া তখনও এ বিষয়ে কোন ঐশী বিধান অবতীর্ণ হয় নি। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, আমার মতে তাদেরকে ফিদিয়ার বিনিময়ে মুক্ত করে দেয়া উচিত কেননা, এরা যে আমাদেরই ভাই বা বন্ধু। অসম্ভব নয় যে, কাল তাদের মধ্য থেকে ইসলামের জন্য আত্মনিবেদিত ব্যক্তি সামনে আসবে। কিন্তু হযরত উমর (রা.) উক্ত মতের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, ধর্মীয় বিষয়ে আত্মীয়তার সম্পর্কের কোন গুরুত্ব থাকা উচিত নয় আর এরা নিজেদের কর্ম দ্বারা হত্যাযোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব, আমার মতে তাদের সবাইকে হত্যা করা উচিত বরং প্রত্যেক মুসলমানকে নিজ হাতে নিজ আত্মীয়কে হত্যা করার আদেশ দেয়া উচিত। মহানবী (সা.) নিজের স্বভাবজ দয়ার কারণে হযরত আবু বকর (রা.)'র পরামর্শ পছন্দ করেন এবং হত্যার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং নির্দেশ দেন যে, যেসব মুশরিক নিজেদের মুক্তিপণ ইত্যাদি প্রদান করবে, তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হবে। অতএব, পরবর্তীতে তদনুযায়ী ঐশী আদেশ অবতীর্ণ হয়।

মদীনায় একদা হযরত আবু বকর (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে হযরত আয়েশা (রা.)'র একটি রেওয়ায়েত আছে। তিনি (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আসেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত বেলাল (রা.) জ্বরে আক্রান্ত হন। তিনি বলেন, আমি তাদের উভয়ের কাছে যাই এবং জিজ্ঞেস করি, বাবা! আপনার শরীর কেমন? আর বেলাল! তুমি কেমন আছ? তিনি বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) জ্বরে আক্রান্ত হলে যে পংক্তি পড়তেন তা হল,

كل امرء مصبح في اهله والموت ادنى من شراک نعله

অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজ পরিবারের সাথে প্রভাতে জাগ্রত হয়, তার মঙ্গল কামনা করা হয় আর বাস্তব অবস্থা হল, মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটতর হয়ে থাকে। আর হযরত বেলাল (রা.)'র জ্বর নেমে গেলে কান্নাকাটি করে উচ্চস্বরে কতক এমন কবিতা আবৃত্তি করতেন যাতে মক্কার আশপাশের বসতিগুলোর উল্লেখ থাকতো আর সেগুলোকে স্মরণ করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে যাই আর হযরত আবু বকর (রা.) কী বলেছেন ও হযরত বেলার (রা.) কী বলেছেন তা তাঁকে (সা.) খুলে বলি। তখন মহানবী (সা.) দোয়া করেন, **"হে আল্লাহ্! আমাদের কাছে মদীনাকেও ঠিক তেমনই প্রিয় বানিয়ে দাও যেভাবে মক্কা আমাদের প্রিয় অথবা ততোধিক প্রিয় এবং একে (তথা মদীনাকে) স্বাস্থ্যকর স্থান বানিয়ে দাও আর আমাদের জন্য এর সা' এবং 'মুদ' -এ প্রভূত কল্যাণ রেখে দাও।** 'মুদ' এবং সা' ওজনের

পরিমাপ। এর জ্বরকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে জুহফার দিকে স্থানান্তরিত করে দাও। জুহফা মক্কা থেকে মদীনার দিকে ৮২ মাইল দুরের একটি স্থান।

উহুদের যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা রয়েছে। তিন হিজরী মোতাবেক ৬২৪ সালের শওয়াল মাসে মুসলমান এবং মক্কার কুরাইশদের মাঝে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তৃতীয় হিজরীর শেষপ্রান্তে মক্কার কুরাইশ এবং তাদের মিত্র গোত্রগুলোর সমন্বয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনীর মদীনায় চড়াও হওয়ার সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে একত্রিত করে কুরাইশদের আক্রমণ সম্পর্কে অবগত করে তাদের কাছে পরামর্শ চান যে, মদীনায় থেকে তাদের মোকাবিলা করা উচিত নাকি বাইরে বের হওয়া সমীচীন হবে?

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে লিখেছেন, "মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে একত্রিত করে তাদের কাছে কুর্‌াইশদের এই আক্রমণ সম্পর্কে পরামর্শ চান যে, মদীনাতেই থাকা উচিত নাকি বাইরে বের হয়ে যুদ্ধ করা সমীচীন হবে? পরামর্শ গ্রহণের পূর্বে মহানবী (সা.) কুরাইশদের আক্রমণ এবং তাদের পাশবিক অভিপ্রায়ের উল্লেখ করেন এবং বলেন, আজ রাতে আমি স্বপ্নে একটি গাভী দেখেছি এবং আমি আরও দেখেছি, আমার তরবারির অগ্রভাগ বা নখ ভেঙ্গে গেছে। পুনরায় আমি দেখেছি, সেই গাভীটি জবাই করা হচ্ছে। আমি দেখেছি যে, আমি নিজের হাত একটি সুদৃঢ় এবং সুরক্ষিত বর্মের ভেতর প্রবেশ করিয়েছি। আরেকটি রেওয়ায়েতে এটিও উল্লেখ আছে যে, তিনি (সা.) বলেন, আমি একটি ভেড়া দেখেছি যার পিঠে আমি আরোহণ করেছি। সাহাবীরা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি এই স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা করেছেন? তিনি (সা.) বলেন, গাভী জবাই হওয়ার মাধ্যমে আমি মনে করি, আমার সাহাবীদের মাঝে কতিপয় শহীদ হবেন এবং আমার তরবারির নখ ভেঙ্গে যাওয়ার মাধ্যমে আমার আত্মীয়দের মাঝে কারও শাহাদতের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে অথবা হয়ত এই অভিযানে আমার কোন ক্ষতি হবে এবং বর্মের মধ্যে হাত ঢুকানোর মাধ্যমে আমি মনে করি, এই আক্রমন মোকালিবার জন্য আমাদের মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থান করা অধিক যুক্তিযুক্ত হবে এবং ভেড়ার ওপর আরোহণ সংক্রান্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা যা তিনি প্রদান করেছেন তা হল, এর ফলে কাফির বাহিনীর নেতা অর্থাৎ পতাকাবাহী মুসলমানদের হাতে নিহত হবে, ইনশাআল্লাহ্‌। এরপর তিনি (সা.) সাহাবীদের কাছে পরামর্শ চান যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে কি করা উচিত? কতিপয় জ্যেষ্ঠ সাহাবী পরিস্থিতির স্পর্শকাতরতা অনুধাবন করে এবং সম্ভবত মহানবী (সা.)-এর স্বপ্নে কিছুটা প্রভাবিত হয়ে এই মতামত দেন যে, মদীনার ভেতরে থেকে মোকাবিলা করাই যুক্তিযুক্ত হবে। মহানবী (সা.)ও এই পরামর্শ পছন্দ করেন এবং বলেন, আমারও মনে হয়, আমাদের মদীনার অভ্যন্তরে থেকেই তাদের মোকাবিলা করা উত্তম হবে। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী, বিশেষভাবে যুবকদের একদল যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি এবং নিজেদের শাহাদতের মাধ্যমে ধর্মসেবার সুযোগ হস্তগত করার বিষয়ে ব্যাকুল ছিলেন, তারা জোর দিয়ে বলেন, শহরের বাইরে বের হয়ে খোলা মাঠে লড়াই করা উচিত। তারা এতটা জোরালোভাবে নিজেদের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন যে,

মহানবী (সা.) তাদের উদ্দীপনা দেখে তাদের কথা মেনে নেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, আমরা খোলা মাঠে বেরিয়ে কাফিরদের মুখোমুখী হব আর জুমুআর নামাযের পর মুসলমানদের মাঝে সাধারণ ঘোষণা দেন যেন তারা **জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্** (অর্থাৎ, আল্লাহর পথে জিহাদ)-এর উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধে যোগদান করে পুণ্য অর্জন করে। এরপর তিনি ভেতরে চলে যান। হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.)'র সাহায্যে পাগড়ী বাঁধেন এবং পোশাক পরিধান করেন, এরপর অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বাইরে আসেন, কিন্তু ইতোমধ্যে পূর্বে উল্লিখিত যুবকরা কতিপয় সাহাবীর কথার ফলে নিজেদের ভুল বুঝতে পারে যে, মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিজেদের মতের ওপর জোর দেয়া উচিত হয় নি। এ চেতনা হওয়ার পর তাদের বেশির ভাগ অনুতপ্ত ছিল। তারা যখন মহানবী (সা.)-কে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত মোটা লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি পরিহিত অবস্থায় আসতে দেখে তখন তারা আরো বেশি লজ্জিত হয় আর সবাই একবাক্যে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের ভুল হয়ে গেছে কেননা, আমরা আপনার মতামতের বিরুদ্ধে নিজেদের মত নিয়ে পীড়াপীড়ি করেছি। আপনি যেভাবে সঠিক মনে করেন সেভাবেই কার্যক্রম পরিচালনা করুন। এর মাঝেই কল্যাণ হবে, ইনশাআল্লাহ্। মহানবী (সা.) বলেন, এটি আল্লাহ্‌র নবীর মর্যাদা পরিপন্থী যে, তিনি একবার অস্ত্র ধারণ করে তা আবার খুলে ফেলবেন, যদি না খোদা নিজে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। অতএব, এখন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যাত্রা কর আর তোমরা যদি ধৈর্য অবলম্বন কর তাহলে নিশ্চিত জেনে রেখ! আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে।

উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) নিজের তরবারি হাতে নিয়ে বলেন, কে আছে যে এর প্রতি সুবিচার করবে? সেসময় যেসব সাহাবী সেই তরবারি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন তাদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ ঘটনার উল্লেখ এভাবে করেছেন যে,

মহানবী (সা.) স্বীয় তরবারি হাতে নিয়ে বলেন, কে আছে যে এটি নিয়ে এর প্রতি সুবিচার করবে? অনেক সাহাবী এই সম্মানের বাসনায় নিজেদের হাত উঁচু করেন। যাদের মাঝে হযরত উমর (রা.) এবং হযরত যুবায়ের (রা.) ছিলেন বরং রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি (সা.) তা কাউকে দেয়া হতে বিরত থাকেন এবং বলতে থাকেন, কে আছে যে এটি নিয়ে এর প্রতি সুবিচার করবে? পরিশেষে হযরত আবু দুজানাহ্ আনসারী (রা.) নিজের হাত বাড়িয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে এটি দান করুন। তিনি (সা.) এই তরবারি তার হাতে তুলে দেন।

উহুদের যুদ্ধে কাফিররা যখন পুনরায় আক্রমন করে আর মুসলমানদের পরাজয় বরণ করতে হয় তখন মহানবী (সা.) সম্পর্কে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, তিনি (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের ঘটনা এবং কিছু মানুষের বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ার পর সর্বপ্রথম হযরত কা'ব বিন মালিক (রা.)'র দৃষ্টি মহানবী (সা.)-এর ওপর পড়ে। তিনি

বর্ণনা করেন, আমি শিরস্ত্রাণের মধ্য থেকে তাঁর (সা.) উজ্জ্বল চোখ দু'টি দেখতে পেয়ে উচ্চস্বরে বলি, হে মুসলমানেরা! আনন্দিত হও, কেননা মহানবী (সা.) এখানে (আছেন)। এটি শুনে মহানবী (সা.) হাতের ইশারায় বলেন, চুপ থাকো। মুসলমানেরা যখন মহানবী (সা.)-কে চিনতে পারে তখন মহানবী (সা.) সঙ্গীসাথী নিয়ে গিরিপথের দিকে রওয়ানা হন। তাঁর (সা.) সাথে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.), হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) এবং হযরত হারেসা বিন সিমা প্রমুখ সাহাবীরা ছিলেন। মহানবী (সা.) উহুদের যুদ্ধের দিন তাঁর সাহাবীদের একটি দলের কাছ থেকে মৃত্যুর শর্তে বয়আ'ত গ্রহণ করেন। মুসলমানেরা বাহ্যত যখন পিছপা হচ্ছিল তখন এই সাহাবীরা অনঢ়-অবিচল ছিলেন আর জীবন বাজি রেখে মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষা করেন এমনকি তাদের মাঝে কয়েকজন সাহাবী শহীদ হয়ে যান। সেই বয়আ'তকারী সৌভাগ্যশালীদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.), হযরত সা'দ (রা.), হযরত সাহল বিন হুনাইফ (রা.) এবং হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

উহুদের যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আরও লিখেন,

যেসব সাহাবী মহানবী (সা.)-এর চতুষ্পার্শ্বে সমবেত ছিলেন এবং তাঁরা আত্মোৎসর্গের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন– ইতিহাসে এর কোন দৃষ্টান্ত নেই। তাঁরা পতঙ্গের ন্যায় মহানবী (সা.)-এর চতুষ্পার্শ্বে ঘুরছিলেন এবং তাঁর জন্য নিজেদের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছিলেন। যে আঘাতই আসত সাহাবীরা তা বুক পেতে বরণ করতেন এবং মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করতেন আর একই সাথে শত্রুর ওপরও আঘাত হানতেন। হযরত আলী (রা.) এবং যুবায়ের (রা.) বহু শত্রুর ওপর আক্রমণ করেন এবং তাদের সারিগুলোকে পিছু হটিয়ে দেন। হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.) তির ছুড়তে ছুড়তে তিনটি ধনুক ভেঙ্গে ফেলেন এবং শত্রুদের তিরের সামনে পরম বীরত্বের সাথে মহানবী (সা.)-এর শরীরকে নিজে ঢাল হয়ে আড়াল করে রাখেন। হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রা.)'র হাতে মহানবী (সা.) নিজে তির তুলে দিচ্ছিলেন আর সা'দ (রা.) এসব তির বিরতিহীনভাবে শত্রুদের ওপর ছুড়ে মারছিলেন। একবার তিনি (সা.) সা'দ (রা.)-কে বলেন, তোমার জন্য আমার পিতামাতা নিবেদিত, তুমি লাগাতার তির ছুড়তে থাক। মহানবী (সা.)-এর এই কথাগুলো জীবনের শেষদিন পর্যন্ত হযরত সা'দ (রা.) অত্যন্ত গর্বের সাথে বলতেন। হযরত আবু দুজানা (রা.) অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিজের শরীর দিয়ে মহানবী (সা.)-এর শরীর মোবারক আড়াল করে রাখেন আর যে তির বা পাথরই আসত সেটির সামনে নিজের শরীর পেতে দিতেন। এভাবে তার শরীর তিরের আঘাতে ঝাঝরা হয়ে যায় কিন্তু তিনি (রা.) উফ্ শব্দটিও করেন নি যেন এমন না হয় যে, তার শরীর নড়ে যাওয়ার ফলে মহানবী (সা.)-এর শরীরের কোন অংশ ঝুঁকির মুখে পড়ে আর কোন তির এসে তাঁর গায়ে বিদ্ধ হয়। হযরত তালহা (রা.) মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করার জন্য অনেকগুলো আঘাত নিজ দেহে বরণ করেছেন এবং এই প্রচেষ্টাতেই তার হাত অসাড়

হয়ে সারা জীবনের জন্য অকেজো হয়ে গেছে। কিন্তু এই গুটিকতক নিবেদিতপ্রাণ মানুষ আর কতক্ষণ এমন বিরাট প্লাবনের সামনে টিকতে পারত যা প্রতিটি ক্ষণেই চতুর্দিক থেকে ভয়ানক তরঙ্গের ন্যায় আছড়ে পড়ছিল। শত্রুদের প্রতিটি আক্রমণের প্রতিটি ঢেউ মুসলমানদেরকে অনেক দূরে বয়ে নিয়ে যেত কিন্তু তীব্রতা কিছুটা কমলেই অসহায় মুসলমানরা যুদ্ধ করতে করতে পুনরায় তাদের প্রিয় মনিবের পাশে এসে জমা হত। কোন কোন সময় তো এমন ভয়ঙ্কর আক্রমণ হত যে, মহানবী (সা.) কার্যত একা থেকে যেতেন। যেমন এমন একটি সময় আসে যখন মহানবী (সা.)-এর চারপাশে কেবল বারো জন সাহাবী ছিলেন। আবার একবার এমন সময়ও আসে যখন তাঁর সাথে কেবল দু'জন লোকই ছিল। এসব নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীর মাঝে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.), হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.), হযরত আবু দুজানা আনসারী (রা.), হযরত সা'দ বিন মু'য়ায (রা.) এবং হযরত তালহা আনসারী (রা.)'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উহুদের যুদ্ধকালে যখন মহানবী (সা.)-এর দাঁত মোবারক শহীদ হয় তখনকার যে চিত্র হযরত আবু বকর (রা.) অঙ্কন করেছেন সে সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) যখন উহুদের যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতেন তখন তিনি বলতেন, সেই দিনটি পুরোটাই তালহার ছিল। এরপর এর বিশদ বিবরণ দিয়ে বলতেন, আমি তাদের একজন ছিলাম যারা উহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.)-এর নিকট ফিরে এসেছিল। সেই সময় আমি দেখি, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষায় তাঁর সাথে যুদ্ধ করছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, মহানবী (সা.)-কে তিনি রক্ষা করছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হায়! এই ব্যক্তি যদি তালহা হত! আমার হাত থেকে যে সুযোগ ছুটে গেছে তা তো গেছেই। তাই আমি মনে মনে বলি, আমার বংশের কোন লোক হলে এটি আমার কাছে সবচেয়ে পছন্দের হবে। এ ছিল তখন হযরত আবু বকর (রা.)'র ভাবনা। তিনি (রা.) বলেন, আমার এবং মহানবী (সা.)-এর মাঝে এক ব্যক্তি ছিল যাকে আমি চিনতে পারি নি। অথচ সেই ব্যক্তির তুলনায় আমি মহানবী (সা.)-এর অধিক নিকটে ছিলাম। সে যত দ্রুত হাঁটছিল আমার জন্য সেভাবে হাঁটা সম্ভব ছিল না। পরে দেখি, সেই ব্যক্তি হলেন, আবু উবায়দাহ্ বিন জারাহ্ (রা.)। এরপর আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট গিয়ে দেখি তাঁর কর্তন দাঁত, অর্থাৎ সামনের দু'টি দাঁত অর্থাৎ, ছেদন দাঁতের মাঝের দাঁত ভেঙে গিয়েছিল আর মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত ছিল। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র গালে (অর্থাৎ, চোয়ালে) শিরস্ত্রাণের কড়াগুলো ঢুকে গিয়েছিল। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা দু'জনই তোমাদের সঙ্গীকে সাহায্য কর। অর্থাৎ, তিনি (সা.) তালহার কথা বলছিলেন। তাঁর (শরীর থেকে) অনেক রক্ত ঝরছিল। মহানবী (সা.) নিজের খেয়াল রাখতে বলার পরিবর্তে বলেন, তালহার খেয়াল রাখ। আমরা তাকে এভাবেই থাকতে দেই এবং সামনে অগ্রসর হই যেন মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে শিরস্ত্রাণের কড়াগুলো বের করতে পারি। এটি দেখে হযরত আবু উবায়দাহ্ (রা.) বলেন, আমি আপনাকে আমার অধিকারের দোহাই দিচ্ছি, এ (কাজ)টি আপনি আমার জন্য রেখে

দিন। ফলে আমি ক্ষান্ত দেই। হযরত আবু উবায়দাহ্ (রা.) সেই কড়াগুলোকে হাত দিয়ে টেনে বের করা অপছন্দ করেন, কেননা, এতে মহানবী (সা.)-এর কষ্ট হতে পারে। এজন্য তিনি সেই কড়াগুলোকে তার দাঁত দিয়ে বের করার চেষ্টা করেন। একটি কড়া বের করলে সেই কড়ার সাথে তার সামনের পাটির একটি দাঁতও ভেঙ্গে যায়। এরপর অপর কড়াটি বের করার জন্য আমি অগ্রসর হই যেন আমিও তেমনই করি যেমনটি তিনি করেছেন। অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রা.) বলছেন, আমি ভাবলাম, অন্য কড়াটি বের করার জন্য আমিও সেভাবে চেষ্টা করি। কিন্তু তখনও হযরত আবু উবায়দাহ্ (রা.) বলেন, আপনাকে আমার অধিকারের কসম দিচ্ছি! এই কাজটি আপনি আমাকে করতে দিন। (এ কথাগুলো) তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন। এতে হযরত আবু বকর (রা.) পিছনে সরে এলে পুনরায় তিনি তেমনই করেন যেমনটি তিনি পূর্বে করেছিলেন। ফলে হযরত আবু উবায়দাহ্ (রা.)'র সামনের অন্য দাঁতটিও কড়ার সাথে ভেঙ্গে যায়। অতএব, আবু উবায়দাহ্ (রা.) ছিলেন সামনের দাঁত ভাঙ্গা লোকদের মাঝে সবচেয়ে সুদর্শন মানুষ। এরপর আমরা মহানবী (সা.)-এর চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা শেষ করে হযরত তালহা (রা.)'র নিকট আসি। তিনি একটি ছোট্ট খাদে পড়ে ছিলেন। আমরা দেখি, তার শরীরে কমপক্ষে ৭০টি বর্শা, তরবারি ও তিরের আঘাত ছিল এবং তার আঙ্গুলও কাটা পড়ে ছিল। অতএব, আমরা তার ক্ষতে মলম লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দেই।

হযরত আবু উবায়দাহ্ (রা.) ছাড়াও হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উকবাহ্ বিন ওয়াহাব (রা.) সম্পর্কেও রেওয়ায়েত রয়েছে যে, তারা এই কড়াগুলো বের করেছিলেন। যাহোক, প্রথম রেওয়ায়েতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। উহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) যখন সাহাবীদের সাথে পাহাড়ে আরোহণ করেন তখন কাফিররাও তাঁর পিছনে পিছনে আসে। যেমন সহীহ্ বুখারীতে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, আবু সুফিয়ান তিনবার চিৎকার করে জানতে চায়, এসব লোকের মাঝে কি মুহাম্মদ (সা.) আছে? তখন মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে উত্তর দিতে নিষেধ করেন। এরপর সে চেঁচিয়ে তিনবার জিজ্ঞেস করে, লোকদের মধ্যে কি আবু কোহাফার পুত্র, অর্থাৎ আবু বকর আছে? পুনরায় তিনবার জিজ্ঞেস করে, এসব লোকের মাঝে ইবনে খাত্তাব, অর্থাৎ উমর (রা.) আছে কি? এরপর সে তার সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে ফিরে গিয়ে বলে, এরা যারা ছিল তাদের সবাই মারা গেছে। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে বলে উঠেন, হে আল্লাহ্‌র শত্রু! আল্লাহ্‌র কসম! তুমি মিথ্যা বলেছ। যাদের নাম তুমি নিয়েছ তারা সবাই জীবিত আর যেসব বিষয় তোমার কাছে অসহনীয় এমন অনেক কিছুই এখনও তোমার দেখার বাকি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর আহত হয়ে অজ্ঞান হওয়ার এবং এর পরের ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে একস্থানে লিখেন,

কিছুক্ষণ পরই মহানবী (সা.)-এর জ্ঞান ফিরে আসে আর সাহাবীরা যুদ্ধক্ষেত্রের চারিদিকে বার্তাবাহকের মাধ্যমে এই সংবাদ পৌঁছে দেন যেন মুসলমানরা পুনরায় দলবদ্ধ হয়। বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন সৈন্যদল পুনরায় একত্রিত হতে আরম্ভ করে এবং মহানবী (সা.) তাদেরকে সাথে নিয়ে

পাহাড়ের পাদদেশে চলে যান। যখন পাহাড়ের পাদদেশে মুসলমান সৈন্যদলের অবশিষ্ট কিছু সৈন্যকে আবু সুফিয়ান দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তখন সে বেশ উচ্চস্বরে ঘোষণা দেয় যে, আমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছি। মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানের এই কথার কোন উত্তর দেন নি, পাছে শত্রুরা মুসলমানদের আসল অবস্থা বুঝতে পেরে পুনরায় আক্রমণ করে বসে আর আহত মুসলমানরা পুনরায় শত্রুদের আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়। যখন ইসলামি সৈন্যদলের কাছ থেকে এই ঘোষণার কোন প্রত্যুত্তর না আসে তখন আবু সুফিয়ানের এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নেয় যে, তার ধারণা সঠিক এবং সে বেশ উচ্চস্বরে ঘোষণা দিয়ে বলে, আমরা আবু বকরকেও হত্যা করেছি। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কেও কোন উত্তর না দেয়ার আদেশ দেন। এরপর আবু সুফিয়ান ঘোষণা করে, আমরা উমরকেও হত্যা করেছি। এটি শুনে হযরত উমর (রা.), যিনি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ একজন মানুষ ছিলেন, উত্তরে বলে উঠতে উদ্যত হন যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জীবিত আছি এবং তোমাদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত আছি, কিন্তু মহানবী (সা.) বারণ করে বলেন, মুসলমানদের কষ্টে নিপতিত করো না আর চুপ থাক। তখন কাফিররা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর ডান ও বাম বাহু (খ্যাত যারা ছিল তাদের)কেও আমরা মেরে ফেলেছি। এ কারণে আবু সুফিয়ান এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা আনন্দে ধ্বনি উচ্চকিত করে বলে, **ওলো হুবল, ওলো হুবল**, অর্থাৎ আমাদের সম্মানিত প্রতিমা হুবলের মর্যাদা উন্নীত হোক, কেননা সে আজ ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সেই মহানবী (সা.) যিনি তাঁর নিজের মৃত্যুর ঘোষণা এবং হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)'র মৃত্যুর ঘোষণা শুনেও নীরব থাকার উপদেশ দিচ্ছিলেন পাছে এমনটি যেন না হয় যে, আহত মুসলমানদের ওপর কাফির সৈন্যরা পুনরায় আক্রমণ করে বসে আর হাতেগোণা মুসলমানরা তাদের হাতে শহীদ হয়ে যায়। কিন্তু এখন যখন এক ও অদ্বিতীয় খোদার সম্মানের প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে এবং শির্কের জয়ধ্বনি উচ্চকিত করা হচ্ছে তখন তাঁর অন্তর ব্যাকুল হয়ে যায় আর তিনি (সা.) সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত আবেগের সাথে বলেন, তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন? সাহাবীরা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কী বলব? তখন তিনি (সা.) বলেন, বলো! **আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল, আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল**। অর্থাৎ, তোমরা মিথ্যা বলছো, হুবলের মর্যাদা উন্নীত হয়েছে– এটি তোমাদের মিথ্যা কথা। বরং এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ্-ই পরম সম্মানিত আর তাঁর সম্মানই অতি মহান। এভাবে তিনি (সা.) তাঁর জীবিত থাকার সংবাদও শত্রুদের কাছে পৌঁছে দেন। কাফির সৈন্যদের ওপর এই বীরত্বপূর্ণ ও সাহসী উত্তরের এত গভীর প্রভাব পড়ে যে, যদিও এই উত্তরের ফলে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধুলিস্যাৎ হয় এবং তাদের সামনে হাতেগোণা কয়েকজন আহত মুসলমান দাঁড়িয়ে ছিল যাদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে মেরে ফেলা জাগতিক হিসেবের দৃষ্টিকোন থেকে একেবারেই সম্ভব ছিল কিন্তু (তারা) পুনরায় আক্রমণ করার সাহসই দেখাতে পারে নি। বরং যতটুকু বিজয় তাদের লাভ হয়েছিল ততটুকুর জন্যই আনন্দ উল্লাস করতে করতে তারা মক্কায় ফেরত চলে যায়।

হযরত আয়েশা (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, **الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ** (সূরা আলে ইমরান: ১৭৩) এটি সাহাবীদের সম্পর্কিত আয়াত–একথা তিনি (রা.) বলেন। অর্থাৎ, যারা আহত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে আর তাদের মধ্য হতে যারা পুণ্যকর্ম করেছে এবং খোদাভীতি অবলম্বন করেছে তাদের জন্য মহাপ্রতিদান রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) উরওয়াহ্‌কে বলেন, হে আমার ভাগ্নে! তোমার পিতৃপুরুষ যুবায়ের এবং হযরত আবু বকর (রা.)ও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধে যখন মহানবী (সা.) আহত হন এবং মুশরিকরা ফিরে যায় তখন তিনি (সা.) আশংকা করেন যে, এরা আবার ফিরে না আসে। তখন তিনি (সা.) বলেন, কে এদের পশ্চাদ্ধাবন করবে? তখন তাদের মধ্য হতে ৭০ জন নিজেদেরকে উপস্থাপন করেন। উরওয়াহ্ বলতেন, তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর এবং হযরত যুবায়ের (রা.)ও ছিলেন। এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন,

এটি একটি অদ্ভুদ বিষয়! বাহ্যত তখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশরা বিজয়ী ছিল আর বাহ্যিক উপকরণাদির নিরিখে চাইলে তারা এই বিজয়কে কাজে লাগাতে পারত এবং মদীনার ওপর আক্রমণ করার পথ তো তাদের জন্য খোলা ছিলই। কিন্তু এমন ঐশী কুদরত প্রকাশিত হয় যে, এই বিজয় সত্ত্বেও কুরাইশদের হৃদয় ভেতরে ভেতরে ত্রস্ত ছিল, তাই উহুদের ময়দানে অর্জিত তাদের এই বিজয়কেই তারা অনেক বড় প্রাপ্তি জ্ঞান করে অতি দ্রুত মক্কায় ফিরে যাওয়াকেই সঙ্গত মনে করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) অধিক সতর্কতাবশত তৃড়িৎ ৭০জন সাহাবীর একটি দল প্রস্তুত করে কুরাইশ সেনাদলের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করেন, যাদের মধ্যে হযরত আবু বকর এবং হযরত যুবায়ের (রা.)ও ছিলেন। এটি বুখারী শরীফের হাদীস।

সাধারণ ঐতিহাসিকরা এভাবে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সা.) হযরত আলী অথবা কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রা.)-কে তাদের পেছনে পেছনে প্রেরণ করেন আর বলেন, তাদের সম্পর্কে খোঁজ নাও, কুরাইশ সেনারা আবার মদীনার ওপর আক্রমণের সংকল্প করছে না তো? তিনি (সা.) তাকে বলেন, কুরাইশরা যদি উটে আরোহিত থাকে আর ঘোড়াগুলোকে এমনিতেই হাঁকিয়ে নিয়ে যায় তাহলে বুঝবে, তারা মক্কার উদ্দেশ্যে ফিরে যাচ্ছে এবং মদীনায় আক্রমণের কোন অভিপ্রায় নেই। কিন্তু তারা যদি ঘোড়ায় আরোহিত থাকে তাহলে বুঝবে তাদের উদ্দেশ্য শুভ নয়। একই সাথে তিনি (সা.) তাদেরকে জোর দিয়ে বলেন, কুরাইশ সেনাদল যদি মদীনার দিকে যায় তাহলে যেন তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদ দেওয়া হয়। আর তিনি অত্যন্ত উত্তেজনার সাথে বলেন, কুরাইশরা এখন যদি মদীনায় আক্রমণ করে তাহলে খোদার কসম! আমরা তাদের মোকাবিলা করে তাদেরকে এই আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাবো।

যাহোক, এই প্রতিনিধিদল যে গিয়েছিল তারা অতিদ্রুত এই সংবাদ নিয়ে ফিরে আসে যে, কুরাইশ সেনাদল মক্কা অভিমুখেই যাচ্ছে। স্মৃতিচারণের এই ধারা আগামীতেও চলবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)